গোলাম কুদ্দুসের কবিতা

রবিন পাল

গোলাম কুদ্দুস অনেক অনেকদিন লেখালিখির জগতে আছেন, কম্যুনিস্ট আন্দোলনেও আছেন বহুকাল। কিন্তু তাঁকে নিয়ে, তাঁর গল্প কবিতা, উপন্যাস, রিপোর্টাজ নিয়ে তেমন আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। আমার দেখার ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু এই আলোচনায় আজকাল আর অবাক হই না। কে যে কখন প্রবন্ধে আলোচ্য হয়ে উঠবেন তা বলা শক্ত। বামপন্থী সংস্কৃতি নিয়েও অ্যাকাডেমিক চর্চা হচ্ছে গত দু দশক ধরে। সেইসূত্রে অনেক হারিয়ে যেতে থাকা লেখক কবি ও তাঁদের লেখালিখির কথা আমরা একটু আধটু জানতে পারছি।

গোলাম কুদ্দুসের জন্ম ১৯২০ সালে ২০ শে জানুয়ারী ফরিদপুরে মামার বাড়িতে। তারপর শৈশবের কিছুটা কুষ্টিয়ায়। শিক্ষাজীবন ও কর্মস্থল প্রধানতঃ কলকাতা। ইতিহাসে এম. এ. পাশ করার পর কম্যুনিস্ট পার্টিতে হোল টাইমার হয়ে যান। একটু বেশী বয়সেই বিয়ে করেছিলেন গোপাল হালদারের মতো। পরলোকগত শ্রীমতী হেনা মৈত্র যেমন পার্টির অনুগত ছিলেন তেমনি দুটি মেয়েদের কলেজের অধ্যক্ষাও হন। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে হেনাদেবী মারা যান। বেগবাগানে গলির মধ্যে জীর্ণ মলিন প্রবেশপথ সাবধানে পার হয়ে কবির কাছে পৌঁছতে হয়। ছোটবেলায় ছিল ফুলের বাগানের দুরন্ত শখ এখন এই বাড়িতে 'স্বেচ্ছাবন্দি'ত্বে কাটে জীবন। অথচ মানুষটির একটা বড়ো মাপের দুরন্ত কর্মীজীবন ছিল। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের ১ম সম্মেলনে যে সব মুসলমান সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন কাজি আবদুল ওদুদ, আবু রশদ। আয়নুসা খাঁ, আব্দুল কাদির, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস। (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২ খণ্ড, সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩১-৩২) এর দু বছর পর ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ২ সম্মেলনে যুগ্ম সম্পাদক হন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং গোলাম কুদ্দুস। এর পাঁচ ছয় বছর পার্টির নেতৃত্ব সরোজ দত্ত,গোলাম কুদ্দুস, অনিল কাঞ্জিলালকে তাদের নীতি ও আদর্শ প্রচারের যোগ্য মনে করে। পার্টির নির্দেশেই আবদুল্লা রসুল ও কুদ্দুস ঢাকা রওনা হয়ে যান। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন মজবুত করার কাজ। ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ হয়েছিল রেলওয়ে কর্মীদের ধর্মঘট। কুদ্দুস কাজ শু করে দিয়েছিলেন রেলওয়ে কর্মীদের মধ্যে। 'ভাঙা ইউনিয়ন আবার জোড়া দেওয়ার কাজে। পার্টির সংগঠনকে প্রকাশ্যে সক্রিয় রাখতে পাশে দৈনিক পত্রিকা প্রয়োজন। অধীর চক্রবর্তীর উদ্যোগে 'দৈনিক সংবাদ' এই নামে declaration.সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন অধীর চক্রবর্তী, অজিত রায়, ননী ভৌমিক, সুভাষ মুলা, গোলাম কুদ্দুস, অণ দাশগুপ্ত, চিন্ময় রায়, নিরঞ্জন সেন। বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকার 'দৈনিক সংবাদ' এর ওপর ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করলেন। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল ১৯৪৮ সালের ১০ই বা ১১ই আগস্ট। 'নয়াদুনিয়া' নামে একটি কাগজ তাঁর সম্পাদনায় বার হতে থাকে। সহসা পার্টি নেতৃত্বের গোপন ডাকে তাঁকে ফিরে আসতে হয় কলকাতায়, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক পদের দায়িত্ব নিতে হয়। সেটা বোধহয়১৯৫০ এর গোড়ায়। এ কাজ তাঁর মনোমত ছিল না। একটি কবিতায় এ পর্ব নিয়ে লিখেছিলেন --- 'কলকাতা থেকে এলো গুপ্ত খৎ---/যেমন ঢাকায় তড়িঘড়ি প্রেরণ, / তেমনি তাঁদের ফরমানে কলাকাতায় সত্বর চাই প্রত্যাবর্তন! / কিন্তু জানানো হয়নি তাতে 'পরিচয়' পত্রিকাটি / ফাঁসির দড়ির মত ঝুলিয়ে দেওয়া হবে আমার গলায়।' (টেল অফ টু সিটিজ, ঢাকা কলকাতা)।

সাহিত্যের জগতের খবর হল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে ফ্যাসিস্ট বিরোধী এক ক

াব্য সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে। তার নাম --- 'একসূত্রে'। সঙেঘর নতুন কার্যালয় ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস এর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে তার কবিতা টির নাম ছিল--- 'করিম বক্স'। বইটিতে গোলাম কুদ্দুসের লেখা ২য় একটি ভূমিকাও ছিল। এই ৪৬ নং এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে তিনি কবিতা পড়েছেন একাধিকবার।গোলাম কুদ্দুস একাধিক কবিতার ও গল্পের বই লিখেছেন। কবিতার বই--- বিদীর্ণ (১৯৫১), ইলা মিত্র (১৯৫২), কুসুমিকা ও বহ্নিশিখা (২০০২), জগৎজয়ের যাত্রী (মাঘ ১৪০৫), ইরাকে ঈগল (২০০৩), স্বেচ্ছাবন্দী (১৯৭৪), নবরামায়ণ, নাচে মনময়ুরী, গল্প উপন্যাস-- মরিয়ম, বাঁদী, লেখা নাই স্বর্ণাক্ষরে, উজানিয়া?, একসঙ্গে?, যুগসন্ধিক্ষণ, সম্বোধন, সুরের আগুন, হে বিদ্যুৎলতা।

গোলাম কুদ্দুস কবিতা রচনা শু করেন চল্লিশে, বই বার হয় পঞ্চাশে। তাই তাঁকে চল্লিশের প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর কবির দপেইদেখব। এ পর্যায়ের কবিতা, বৈশিষ্ট্য অনেকেই আলোচনা করেছেন। সুমিতা চত্রবর্তীর ভাষায় (ক) 'কবিতা যেন দ্রুত ফিরে এলো সহজ, সুবোধ্য ভাষার কাঠামোর মধ্যে।' (খ) 'কবিরা হয়ে উঠলেন গভীরভাবে সমাজমনস্ক ও র াজনীতিসচেতন'। যে রাজনীতি বিব্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে ও যেমন সমাজমনস্ক ও রাজনীতিসচেতন'। 'সমাজতন্ত্রব াদের শিক্ষা অনুসারেই তাঁদের কবিতার প্রধান অবলম্বন হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, পুঁজিবাদ বিরোধিতা -- ত্রমে ফ্যা সিজম্ - বিরোধিতা। সেই সঙ্গেই সাধারণ 'মানুষ ও তাদের জীবনযাপনের সঙ্কট।' অশ্রু সিকদার বলেন -- 'ইতিহাস চেতনা শুধুমাত্র বত্তব্য হিসাবে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত নয়, তাঁরা brutally integrated into history. এ সময় তাঁরা ব্বিাস করেছিলেন কালজ্ঞান ভিন্ন কবির গত্যন্তর নেই। বার্ণিক রায় বলেন, বাংলাদেশে চল্লিশের কবিদের বৈশিষ্ট্য সমাজ সচেতনতার সঙ্গে বাস্তবতা ও বুদ্ধি তীক্ষ্নতার সমন্বয় । তিনি আরও বলেন---'বামপন্থীরা অন্ধজগতের কথা বাদ দিয়ে আশ ার ও আকাঙ্খার কথা অনুভূতিময় শব্দের পরিবর্তে চিত্রের রূপান্তরের বদলে শুধু বিকৃতি প্রকাশ করেন। কবিতা একটি কঠিন সাংগঠনিক কর্ম, কবিতার উপাদান সামগ্রিকতায় কিভাবে সমন্বিত হয় একটি কবিতায়, কিভাবে বহু ও বিভিন্ন বস্তু ঐক্য আনে --- এগুলি সম্বন্ধে তাঁদের অবহেলা চূড়ান্ত। গোলাম কুদ্দুসের কবিতার বিস্তৃতি আলোচনায় এইসব মন্তব্যের সারবত্তা আমরা আলোচনা করবো। দেখবো তাঁর কবিতা কতটা বিবৃতিধর্মী, কতটা কবিতার কঠিন সাংগঠনিক কর্মে সিদ্ধ।

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'বিদীর্ণ' ১৯৫১ সালে প্রকাশ পেলেও কবিতা লেখা শু করেছিলেন অনেক অনেক দিন আগে। প্রসঙ্গতঃ বলে নিই ফ্যাসিবাদবিরোধী কবিতা সংকলনে স্থান পেয়েছিল তাঁর 'করিম বক্স' কবিতাটি। খুবই সরল সহজ ভঙ্গি তে করিম নামে এক মজুরের বসন্ত রোগাত্রান্ত অবস্থায় লড়াইয়ে সরাসরি শরীরীভাবে যোগ না দিতে পারার আক্ষেপে কবিতা শেষ। সংকলনটি, কবিতাটি এখন দুর্লভ, তাই শেষ চার পংক্তি উদ্ধৃত করি ঃ

'করিম বক্‌সের পকসে যেন জগত গেছে জুড়ে,
যখন রত্ত জাগল তখন, অঙ্গ গেছে পুড়ে।
ইংরেজী প্যাকস জার্মানী প্যাকস। নানান প্যাকসের চাপে
প্যাক সে পক্‌সে মিতালীটা চলে সমান দাপে।'

'বিদীর্ণ' কাব্যসংকলনের আবহে আছে দেশভাগের বিদীর্ণতা। 'জীবনগ্রন্থ' নামের দীর্ঘ কবিতায় কবি গ্রন্থকীট স্বপ্নিল এক যুব মানস কিভাবে পরিপার্শ্বের চাপে পরিবর্তিত হচ্ছে তা দেখান। একদিন বইয়ে বাধ্য মন ইতিহাস ও সাহিত্যের বিদ্যা অ ালস্যে গড়ের মাঠ, উদ্ধত যুবতী দেখে কাটাত এখন দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, কন্ট্রোল, নিষ্পাপ শিশুর মাথার ওপর আল্লার গজব, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ভাগাড়ের মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে সে অস্থির। 'দুরন্ত দুর্বার নড়ে/ বুঝি ফেটে পড়ে / হৃৎপিণ্ড দেশ জননীর।' বস্তাপচা কেতাবের মদ সরিয়ে রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরে চালের কাতারে ফুটপাতের উপর ক ারখানার দ্বারে 'নতুন জীবনকে খুঁজি'। খানিকটা সমরসেনীয় স্বর তবে সেই নাগরিক ব্লেষে তীক্ষ্নতা নেই। 'প্রান্তর' কবিতায় দুরন্ত দুর্বার আশা মর্মকোষে জাগিয়ে জীবন সূচনা, তারপর মানস ব্রহ্মাণ্ডে ভূমিকম্প, পুঞ্জীভূত ধবস, চারদিকে ত্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, ধূম্রের বিষাত্ত পুষ্প ফোঁটা, আর স্বাতন্ত্র্যের গুরভার একটা বইতে না চাওয়া, প্রান্তরে মিশে যাবার ইচ্ছা। এখানে কবি ইমেজের ভাষার কথা বলেছেন তাই পাঠকের কল্পনা ডানা মেলতে পারে। সমিল কবিতা 'সোনার চাঁদ ছেলে সব'

বিপ্লবী আবাহনের কবিতা। 'লক্ষ্মীছাড়া জীবনের বজ্র আশীর্বাদ/ খাদের বর্দ্ধিত বুকে দিয়ে গেছে সূর্যের সংবাদ / ধূসর ঊষর পথে পথে' যারা স্বাচছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছে 'মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞার জ্বালা।' কবির সংশয়হীন বিশ্বাস --- 'জানি জানি একদিন/ অবশ্যই উদ্বেলিত জনতার সমুদ্রে সঙ্গীন / জাগিবে বিপ্লব বন্যা --- চন্দ্রে চন্দ্রে লাগিবে গ্রহণ।' কবিতা হিসেবে ভালো। পাঠকের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'ঝড়ের খেয়া' এবং সুকান্তের একটি দুটি কবিতা। 'একজনের জন্মদিনে' কবিতায় সনেট ধাঁচে শ্রেণীবিভাজিত পৃথিবীতে কবিতা একজনের স্বপ্নময়, কস্তুরি সুবাসিত রাঙাপথ এবং অন্যজনের কুমারী মেয়ের ভ্রূণের মত উদ্ভ্রান্ত জীবনকে দেখেন। 'লেনিন' কবিতায় যদিও তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা আছে তবু লেনিন নয়, লেনিনকে সামনে রেখে ভারতের বিক্ষুব্ধরাত্রির মধ্যে পথ স্পষ্ট করার জন্য লেনিনের সাহায্য চান। সুকান্তের 'লেনিন' ও জাতীয়, তবে আত্ম উদ্বোধনের কবিতা। 'করাতী' কবিতায় করাতীর ইমেজ দিয়ে শু। কাঠচেরা, অরণ্য নিকেশ করাত ভেঙে কাস্তে গড়া, কাঠ জ্বলে ওঠা, কাস্তের দাঁতে আগামী দিনে ফসলের সোনালী মাঠ হেসে ওঠার কথা। কাশীরাম দাস নিয়ে পংক্তিটির কিন্তু সদ্ব্যবহার হয় নি। 'হিসাব নিকাশ' -এর রেলপথের কথা, চারপাশে স্বত্বাধিকারের ছক কাটা সীমানা, জমি নিয়ে বিরোধ, কবির বিশ্বাস---'একদিন হবে সব কড়াগণ্ডা হিসাবে নিকাশ।' হয়তো অপ্রাসঙ্গিক তবু উল্লেখ কবি এই সময়ই পাবলো নেদার Let the rail splitter Awadeও তার ইংরেজি ও বাঙলা অনুবাদ বাঙালী বামপন্থী তণ কবিদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। একটি কবিতায় জিরাফের প্রতীকে জগৎজোড়া গ্রাসের ছবি। চাঁদ ও প্রতীক। (জিরাফের গলা) কবির কখনো মনে হয় এই পৃথিবী যেন এক আনারস, যা রসাল, মধুর, অথচ যা আস্বাদনে বাধা। কবি কখনো সরাসরি না বলে প্রতীকের বর্ম খুঁজছেন বোঝা যায়। 'রাজপথ' কবিতায় কর্মপথের দ্বিধা কাটিয়ে অবিলম্বে শোনান --- 'বিজয়ী পতাকা হাতে এই পথে গান গায় শ আর মহাচীনে জনগণ মন এই পরিচিত পথ দেশ দেশান্তরে'। দুটি কবিতা ইতিহাস চিহ্নিত। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই ভারতব্যাপী ডাক তার ধর্মঘটে ব্যাপক মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন। কবি লক্ষ্য করেছেন সাম্রাজ্যের অন্ধনিয়তি নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলে, শ্রমিক মধ্যবিত্ত হাতে হাত মিলিয়েছে, বাসুকি জাগছে, দৈত্যবধের প্রতিজ্ঞায় সংহতিবদ্ধ মানুষ। এরই পাশে ১৬ই আগষ্ট দাঙ্গায় নিধনের বীভৎসতা, কবির সক্রিয় প্রতিরোধ, লুঠতরাজ, নারী নিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক জিগার, উদ্ধারশিবির। ক্ষুব্ধ কবি শ্লেষকণ্ঠে বলেন, রবীন্দ্র নজ্রল, ক্ষুদিরাম, দেশবন্ধু, মহসীন এরা কেউ নিশ্চয়ই জন্মায়নি এদেশে। নিদ্ধ ক্রোধে লোক অস্ত্র শানায়। কবি শেষ পর্যন্ত বলেন---'রাস্তা আর মনের আবর্জনার ছাপ/ রাস্তা আর মনের দুর্গন্ধের পাপ/ ঢেকে দাও মুছে দাও।' হিন্দু মুসলমান হাত মেলানোর ডাকে কবিতার সমাপ্তি। (২৯শে জুলাই) কবিতাটির শিল্পমূল্য যাই হোক দলিলমূল্যযথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে দাঙ্গাবিরোধী কর্মতৎপরতা কালে কবি ছুরিকাহত হন, মানিকবাবুর 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে একটি চরিত্রের এরূপ বিপন্নতা তাঁকে আলাদা করেই করা। চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী সন্দীপের ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান লালমোহন সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৬ বছর আন্দামান ও অন্যান্য বন্দী নিবাসে কাটিয়ে আগষ্ট ১৯৪৬এ মুক্তি ও কিছুদিন পর স্বগ্রামে ফিরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অক্টোবরে মৃত্যু।। এই লালমোহনকে তাঁর আত্মাহুতিকে স্মরণ করতে গিয়ে কবি ইংরাজের divide and rule সালিসি, বিশ্ব পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস চিৎকার, হিটলারী আক্রমণ, ছদ্ম জনপ্রেমী নেতাদের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে বুক চাপড়ানো ইত্যাদি এনে ক্যানভাসিকে বড়ো করে নেন। কবির দুঃখ লেলিনের সংগ্রামের ডাক, রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার আজ চাপা পড়েছে। তবে স্বপ্ন তার একদিন এই জনঘাতী এবং ছদ্মবেশী নেতাদের জনতা শায়েস্তা করবে। (লালমোহন স্মরণে) 'আয়া' কবিতায় দাঙ্গা কলুষিত কলকাতা যেখানে 'কত মুকুল ঝরে উন্মাদ উত্তাপে/ কত মহীহ, পড়ে ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড দাপে।' আর সম্পাদকেরা -- নিরীহ ভদ্র সন্তানের বেশেএক একটি ছিন্নমস্তা। ভারতীয় জীবন যেন আয়ার মতো, ইংরেজ প্রভুর সেবায় সতর্কতা। এতে ধিক্কার চাপা থাকে না।

কবি কখনো পতাকা তুলে নিয়ে দাঙ্গা বিধবস্ত ক্ষতবিক্ষত দিনে জীবনের তান উচচারণ করেন (পতাকা) কখনও হিন্দু মুসলমান একাকারে সমুদ্র প্রতীক আনেন, গর্তবাসী সাপের অতর্কিত আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন (বন্যা), দেশবিভাগের বেদনায় ব্যথিতহয়েও শকুনির দরবারে শনাক্ত করেন, চান -- হাহাকার স্তব্ধ হোক, অঙ্কুর উদগত হোক (পার্টিশন), কখনো হলিউডি মত্ততার সচেতন প্রয়োগ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধের আড়ালে 'একই হাত কলকাঠি টেপে বারবার' একথা খেয়াল রাখেন আর আত্মোৎসর্গের অতীত ইতিহাস স্মরণ করেন। অন্তিম স্তবকে কবি বলেন--- 'পথে প্রান্তরে আকাশে বাতাসে / জ্বালাময় নিশ্বাসে প্রশ্বাসে / জ্বলে উঠবে উন্মত্ত আগুন লেলিহান / অগ্নিগিরি ফেটে পড়া তপ্ত লাভাস্রোতে?

বিপ্লবের গান।' (রাজপথ) 'বন্যা'র জনসমুদ্র প্রসঙ্গে পাঠক তুলনা করতেই পারেন বিষ্ণু দের 'ঘোড়সওয়ার' বা 'পার্টিশন' কবিতার অঙ্কুরের প্রসঙ্গে সুকান্তের অঙ্কুর ইমেজ ব্যবহারের কিছুটা ভিন্ন মুন্সিয়ানা। সবশেষে আছে একমাত্র শেষ কবিত াতেই আছে ব্যক্তিপ্রেমের কথা, ঘর বাঁধতে না পারার বেদনা, তবে এখানেও নিপীড়িতের জন্য বেদনা---'কোথাও আমরা ভালো নেই।' প্রথম বইটি পড়ে আজকের পাঠকের যে সব কথা মনে হবে তা হল--- (ক) কবি যে কোনো দায়বদ্ধ তণের মতো স্বপ্নমগ্ন (খ) সক্রিয়তা তাঁর জীবনপন্থা (গ) গ্রন্থ সর্বস্ব জন মমতা নয় তাঁর কবিতা (ঘ) শিল্পরূপের সূক্ষ্মতার দিকে ঝোঁক না দিয়ে সামাজিক সংঘাতের ব্যাপারটা তুলে ধরার পক্ষপাতী --- তবে সাংবাদিক ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। পাঠক নিশ্চয়াই স্মরণ করবেন এই পঞ্চাশের দশকেই কোনটা এ নিয়ে সবশেষে কিছু কথা বলল।

'ইলা মিত্র' নামে যে কাব্যগ্রন্থটি পাওয়া যায় তা ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ২০০২ হলেও শুধু 'ইলা মিত্র' কবিতাটি ১৯৫২ সালে বই হয়ে বেরিয়েছিল এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আজও অনেকে তাঁকে অর্থাৎ কবি গোলাম কুদ্দুসকে ইলা মিত্র কবিতার কবি হিসাবেই চেনে। একসময় শম্ভু মিত্র ও অন্যান্যদের কণ্ঠে নানা সভাসমিতি অনুষ্ঠানে এ কবিতা আবৃত্তি হয়েছে। শোনা যায় কৌতূহলী হয়ে বর্ষীয়ান অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং জীবনানন্দ দাশ প্রকাশকের ঘরে গিয়ে এই বইটি সংগ্রহ করেন। প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু মানসে এ কবিতার আবেদন ছিল অত্যন্ত বেশী। উদ্দিষ্ট মানুষটি বনলতা সেন নয়, মাঠে ময়দানে লড়াইয়ে সামিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক সাহসিক রমণীয় সত্য কাহিনী। এ কালের মানুষের কাছে ইলা মিত্র নামটি পরিচিত নয়, কিন্তু একদা এ নাম ছিল বঙ্গবিখ্যাত। তিনি ছিলেন নাচোল কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী। লীগ সরকারের পুলিস ও গুপ্তচর তাকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়েছিল। সেকারণে নাচোল ও নবাবগঞ্জের সাঁওতাল কৃষক কর্মী বৃন্দাবন সাহার সঙ্গে স্থানান্তরে যাবার সময় রোহনপুর স্টেশনে সন্দেহক্রমে তিনি ধরা পড়েন ১৯৫০ সালের ৭ই জ ানুয়ারী। লীগ সরকারে পুলিস জেরায় তাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে বীভৎস অত্যাচার শু করে। তখন পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিই অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লীগ সরকারের বন্দুক ও গ্রেপ্তার তুচ্ছ করে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। তেভাগার দাবিতে নাচোলের কৃষক আন্দোলন তারই পরিচয় বহন করে। ১৯৪৬ - ৪৭ এ কমিউনিস্ট পার্টির গণ সংগঠন কৃষকসভার নেতৃত্বে জমিদার জোতদারদের অত্যাচারের বিদ্ধে বঞ্চিত ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের গণ সংগ্রাম শু করে দেয়। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও মালদহ জেলায় এই আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে। মালদহ জেলার অন্তর্গত সাঁওতালপ্রধান নাচোল ও নাবাবগঞ্জ থানায় এক শক্তিশালী সংগ্রাম ঘাঁটি গড়ে তোলেন রমেন মিত্র (ইলা মিত্রের স্বামী), অনিমেষ লাহিড়ী, আজহার হোসেন প্রমুখ। ইলা মিত্র প্রথমে ছিলেন স্বামীর সহযোগী, পরে নিষ্ঠাব্রতী কর্মী হিসেবে হয়ে ওঠেন--- 'রাণী মা'। ১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী চারজন পুলিস অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাষীদের হাতে নিহত হলে পুলিসী তাণ্ডব তীব্রতর হয়। নাচোল ঘোষিত হয় নিষিদ্ধ এলাকা। এর দুদিন পর গ্রেপ্তার। পুলিস ইলা মিত্রকে হাতে পেয়ে প্রথমে উলঙ্গ করে সেলে বন্দী করে, তারপর বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায আঘাত করে। তারপর প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় রাত্রে তাঁকে এস. আই. এর কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে, দুটো লাঠির মধ্যে পা ঢুকিয়ে চাপ দিতে থাকে, চুল উপড়ে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত যৌনাঙ্গের ভিতর গরম ডিম পুরে দেয়। অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। পরের দিন সকালে জ্ঞান ফিরলে এস. আই. ও সিপাহীরা বুটের লাথি মারতে থাকে, ডান পায়ের গোড়ালিতে পেরেক ফুটিয়ে দেয়, তারপর রাত্রে সিপাহিরা ধর্ষণ করে। রক্তাক্ত অবস্থায় পরের দিন ঘুষি মারতে মারতে তঁ াকে নবাবগঞ্জ জেলে ঢোকানো হয়। এর কয়েকদিন পর জোর করে একটা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়। শরীরের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে তাকে সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গে। (তথ্যসূত্র - ধনঞ্জয় দাশের বই 'আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাঙলাদেশ', এই বইতেই ইলা মিত্রের কোর্টে পেশ করার অত্যাচার বিষয়ক জবানবন্দীটি অ াছে।) শোনা যায়, শ্যামাপ্রসাদ বিধান সভায় দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কম্যুনিস্ট সংগ্রাম করার জন্যই ইলা মিত্রের এ দুর্গতি এভাবে ব্যাপারটা উপস্থিত করেন। তখন কমিউনিস্ট কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং গোলাম কুদ্দুস রাত ারাতি কবিতাটি লিখে ফেলেন। পুরো কবিতাটি 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় একদিন ছাপা হয়ে যায়, অচিরেই বই হয়ে হাতে হ াতে ঘুরতে থাকে। অতএবং বলা যেতে পারে এই কবিতাটি, তার প্রকাশ, তার প্রচার, নিগৃহীত নেত্রী এর বিষয় এক ঐতিহা সিক ঘটনা পরস্পরার অংশ। এ কবিতা রচনার উদ্দেশ্য ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবনকে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত করা, তাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। স্বভাতঃই কবিত্বের সূক্ষ্ম কৌশল যা কতিপয়ের উপভোগ্য, তা মিলবে না। (সুভাষ মুখে

াপাধ্যায়ের একই বিষয় নিয়ে 'পাল বোন' কবিতাটি তুলনীয়) তবু কিছু বিচিছন্ন পংক্তি যথেষ্টই কাব্যগুণোপেত-- 'ধীরে ধীরে চেতনা - কন্দরে / ঝরে পড়ে আশার আলোক' / বাঁশরীর আনন্দের সুরে / ধীরে ধীরে তোলে তারা মাথা।' সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব এই মহিলা চরিত্রটি চেনা যায় কবিতাটি থেকে। পাঠক যেন প্রত্যক্ষ করতে পারেন সেইসব দিন, সেই মানুষটি। 'ইল া মিত্র কৃষকের প্রাণ / ইলা মিত্র ফুচিকের বোন / ইলা মিত্র স্তালিন নন্দিনী' ---এইসব পংক্তিতে কবি তাঁকে ঝিাসংগ্রামীদের সহোদরা করে কবিতাটির সাম্যচেতনা ও ঝিচেতনা স্পষ্ট করেছেন। ইলা মিত্র স্তালিন নন্দিনী -- এ পংক্তি অকম্যুনিস্টগের ক াছে সে সময় নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়। কবি অভিমান বশতঃ একসময় এ কবিতার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ষষ্ঠ মুদ্রণে আবার কবিতাটি একালের পাঠকের কাছে আসছে। এই কবিতাটি সূত্রে বলে নেওয়া যাক 'কমরেড স্তালিন জাগো' কবিত াটির কথা, যা স্তালিনের মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হয়ে লেখা। এ কবিতাতেও কবি নিজেকে বলেছেন--- 'আমি এক অধার্মিক স্তা লিন - সন্তান'। কবি এ কবিতায় স্তালিনকে সূর্যসন্ধানী, মানুষের নবজন্মদাতা, কবির কবিতা পিতৃসম, সৃষ্টিস্বর্গের রচয়িতা প্রভৃতি বলেছেন, বিচলিত ঝিনেতৃত্বের ও সংগ্রামী ঝিমানবের অশ্রুসজলতার কথা বলেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন---একদিন 'ধ্রুব নক্ষত্রের স্থৈর্য ভঙ্গ হবে নিদ্ধ আবেগে / রক্তমাংসে জাগবে স্তালিন / সেই সাথে উঠবে লেনিন' এবং ব্রহ্মাণ্ডের কোণে কোণে উড়বে সাম্যের পতাকা। স্তালিনের মৃত্যুতে পার্টির এক দলের শোকবিহ্বলতা, স্তালিনকে নিয়ে বাঙলা কবিতার সংকলন, ব্রুশ্চফ জমানায় স্তালিনবিদ্বেষের ঢেউ এখানেও এসে পড়া এবং একটা অস্পষ্ট অবস্থানও আমাদের মনে পড়বে। 'চারা' কবিতায় বিপ্লবের চারা, গাছ, ভবিষ্যতেফলের সম্ভাবনা বংশধরদের জন্য এবং প্রসঙ্গ সূত্রে স্তালিন বন্দনা। তবে পরবর্ত্তীকালে স্তালিনের নিন্দাও হয়েছে বিস্তর, সি. পি.আই.ও তাতে গলা মিলিয়েছে সি. পি. এম. ও। গোলাম কুদ্দুস এ ব্যাপারে নীরব। শান্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা 'শান্তি চাই' --- শেষ পংক্তিতে জোর এ সময়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য। ক্ষুধাতুর ভারতে, হলাহল পূর্ণ অবস্থায়, চুষে খাওয়া পৃথিবীতে, রাক্ষসের ভূমিকার বিদ্ধে শান্তির সংগ্রাম। নাগাসাকি, হিরোসিমা, মরণ তাণ্ডবের পর কবি ডাকছেন সমুদ্রে পাল তুলে ধরার। কোরিয়ার ধবংসে প্রতিরোধ উদ্যত মানুষ, এভাবে তারা শোধ করবে জন্মভূমির ঋণ। (কোরিয়া) একদিন যে ছিল অজাতশত্রু যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে সে বিপ্লবের সঙ্গীত ধরল। কবি ধিক্কার দেন সেই দেশীয় কুলাঙ্গারদের, যারা দেশকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়, যারা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে শত্রু। কবি কাতর হয়েডাক দেন--- 'জননী গো! মূর্ছা ভেঙে জাগো।' 'দলিতা ভূজঙ্গীসম ফণা তুলে ধরো, আত্রোশে গর্জিয়া ওঠো দুরন্ত নাগিনী।' (বাসুকির ইমেজ কবির প্রিয়) এবার অজাতশত্রুত্ব বিসর্জন দিয়ে শত্রুত্বের শপথ। কবি তাঁর মা বাবা সব াইকে দেখেন জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত, তারা বলে -- মরে গেলে বাঁচি। অন্যদিকে মানুষের আকুল বাঁচার ইচছা, সে তো বাঁচা নয়, এটো পাতা চাষী। কবি চান না এসব। 'তার চেয়ে ধনুকে টঙ্কার দাও, হে দ্র পথিক।' (মরা বাঁচা), যুদ্ধের বিদ্ধে শানিত কলমের প্রতিবাদ কাম্য। কেমন শান্তি কাব্য---ইলিয়াদ থেকে মেঘনাদবধ সবই তো যুদ্ধকাব্য। যুদ্ধশেষে কিছুদিনের শা ন্তিপর্ব, তারপর আবার যুদ্ধ। (শান্তিকাব্য)। ষষ্ঠ মুদ্রণে পরবর্ত্তীকালে অনেকগুলি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ঘেরাও' কবিতা টি পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট কালে শ্রমিক শ্রেণীর নব্যসংগ্রামী রীতির প্রশংসা করে লেখা। কবি চতুর্দিকে দেখেছেন প্রতিত্রিয়ার চত্রান্তে 'আশা উদ্দীপনা ঘিরে নাচে মরীচিকা', ঘেরাও করে তিনি এ অবস্থার অবসান চান। 'নতুন দিগন্ত' কবিতায় তিনি নতুনের প্রতি আস্থা রেখে মহাযৌবনের আশীর্বাদে ভারতের বন্দরে বন্দরে থাকা কলম্বাসদের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেছেন। কবি চতুর্দিকে লক্ষ দাবিদার সোচচার কণ্ঠ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের সঙঘবদ্ধতা মালাটা ছুঁড়ে দেয় জনতার ম াঝে--- 'বেদনা আর বিহ্বলতা / সভয়ে কাঁপতে লাগল মালার স্পর্শে।' (মালা) চেনা ফেরিওলা যখন পুলিশের খপ্পরে পড়ে তখন সেই সুধীর পুলিসের সামনে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ে বলে 'বুকের উপরে চালাও তোমার গাড়ি' --- শুনে পুলিস ঘাবড়ে যায়। কবি এভারেস্ট জয়ী তেনজীংকে সম্বোধন করে বলে এই ধূলি ধূসরিত ভিড়ের চরণতলে তিনি যেন একবার কুর্নিশ করে যান, কারণ এদের সংগ্রাম এভারেষ্ট জয়ের কোনো অংশে কম নয়। (সাক্ষাৎ) কবির সঙ্গে দেখা এক দা রিদ্র্যপীড়িত, কারাবাস ক্লিষ্ট পথিক কমরেডের যে শত অভাব সত্ত্বেও 'নিদ্রাহীন রাত্রে স্বপ্ন দেখে তোমাদের ম্লান মুখের' অ াবার ঘুরছে দুর্ভিক্ষের অন্ধকার হেসে হেসে।' এরা আকাশের পথনির্দেশক তারার মতো, এমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার সংগ্রামেরই স্বার্থে। (তাকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো) তৃষিত জীবনে জলের প্রার্থনার উপমায় তিনি পীড়িত জীবনে স্ব স্তির জলের কথা বলেছেন (তৃষিত চাতক) 'ডন ভল্গা খাল' কবিতাতেও আছে স্পষ্ট স্তালিন ও সোভিয়েত বন্দনা।নিজেকে মনে হয় 'স্তালিনের হাতের 'বাঁশি' আর 'সোভিয়েত স্বর্গ সুরধুনীর বাণীমন্ত্রে জীবন মভূমি পার হয়ে যায় নির্ভয়ে ! নতুন ভ

ারতে, যা স্বাধীন হয়েও পরাধীন, সেখানে গদী পেয়ে নিরাপত্তালোভী মন্ত্রীদের প্রতি কটাক্ষ আছে 'মন্ত্রীদের প্রতি' কবিতায়। 'নতুন দিগন্ত' কবিতায় নবীনের বন্দনা আর 'বুড়োটা' কবিতায় সদা আশাবাদী, বুড়োদের বন্দনা। একটা কবিতায় বলেছেন --- ওপার বাংলায় হিতৈষিদের শুভ কামনার উত্তরে, ভারতীয় সেনারা লড়েছে বাংলাদেশের যুদ্ধে। এপার ব াংলায় আমরা ভালই আছি। 'ওপার বাংলায় তোমরা জাগ্রত প্রহরী হও।' সত্যই কি সে সময় আমরা ভাল ছিলাম? এ প্রশ্ন উঠলে কি উত্তর হবে। তেনজিং ও সুধীরের পুলিশের প্রতিরোধ তুলনা ছেলেমানুষি। দাঙ্গা এবং ভেদাভেদের গ্লানি পার হয়ে একদিন ভিন্ন মানুষ দেখা দেবে এবং বিশ্বাস থেকেই লেখা ---'যেখানে বয়স্করা শিশুদের চেয়ে নির্বোধ।' 'বিশ্বব্যাঙ্কের পঙ্গপালদের মধ্যে আছে বজ্রাগ্নি 'আরতি' ---এই স্থির প্রত্যয় জেগেছে 'অশ্রু সুধা বজ্রবচন' কবিতায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করে জ্যোতিষীকে 'মূর্তিমান শনি' আখ্যা দিয়ে কবিতার শেষে কবি একথা জানান ---'সব মানুষের জাত ব্যবসাই লুপ্ত হবে ভবিষ্যতে, তোমারটাও যাবে রসাতলে।' এবং 'মানুষ যদি বিশ্বজুড়ে পরস্পর হাত রাখে হাতে। সব আঙুলের আংটি যাবে খসে।' এসব সরলীকৃত স্বপ্ন কারণ দৈনিক খুললে দুর দর্শন খুললে বিপরীত ধারণাই হবে। কবি দেশে ক্রমবর্ধমান বেক ারীত্ব, দুর্নীতি দেখে বীতশ্রদ্ধ, দেবতা কৃষ্ণের শক্তি অবসিত, নারদের প্রেরণা মানুষে মানুষে বিবাদের আর ফল প্রত্যাশী কর্মের জগৎ --- পৌরাণিকতার একালীন ব্যাখ্যা 'নবগীতা' কবিতায়। একটু পুরোনো ধাঁচে লেখা 'মস্বপ্ন' কবিতায় তিনি 'চক্ষে ম, বক্ষে ম, সারা অঙ্গে ম, সব অনুভূতি / রস কষহীন। ম আমি, ম তুমি / বিশ্বময় পুঁজির তাণ্ডবে সর্বত্র তপ্ত মভূমি।' এবং শস্য শ্যামলতা চলে যাচ্ছে মভূমির অভিশাপে। একদিন এ অবস্থা বদলাবে। জ্যোতিষের প্রতি আবার ব্যঙ্গ 'অকথিত বাণী' কবিতায় 'মুক্তিদাতা' কবিতায় প্রথমে 'কেউ আমাকে মেরে ফেললেই হয়ত বেঁচে যাই' তারপর গুদেব ও স্তোকবাক্য এড়িয়ে তিনি এই বিশ্বাসে--- 'এসো বরং শ্রমিকদেরর হাত ধরি/ তাদের চলন বলনের উপরই যখন নির্ভর করছে/ দুনিয়ার ভবিষ্যৎ/ এবং আমারও মুক্তি।' কবি জানেন--- 'বিশ্ব বুর্জোয়া বাঘের গলায় চিরদিনই ফুটে আছে কমিউনিজমের হাড় ফলে দ্বান্দ্বিক সংঘাত বহমান। 'ভিক্ষুকের অধম' কবিতায় তিনি সারা পৃথিবীতে দেখেছেন ভিক্ষুক। এ কালের মানুষ বাইরে বণিক বা 'বিদ্বান' কিন্তু ভিতরে 'কীটাণু কীট ভিক্ষুকের অধম'। কবি ভিক্ষুকের ঝুলি খুলে বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে চান তাদের নির্মম উদাসীন শকুনবৃত্তি। ভালো কথা, কিন্তু যে কবিত্ব কৌশলে এই দেখিয়ে দেওয়া নিছক স্টেটমেন্ট থেকে কবিতা হয়ে ওঠে সেটা না থাকলে বারংবার উচ্চারণে আগ্রহ থাকে না। 'পাশের বাড়ির বাগান' দীর্ঘ কবিতা। এতে কাহিনীর আভাস । কবি দেখেন পাশের বাগানের শোভা, কীটপতঙ্গ, সেখানে সম্পন্ন ডাক্তারের ছোটমেয়ে তিনদিন স্কুল করে। অভিভাবকরা এদিক ওদিক বসে থাকে। ডাক্তার চান এমন পাতা ভরা গাছ যা 'প্রত্যেকটি হবে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার'। এই বাগান একদা পত্তন হয়েছিল গুণ্ডা লেলিয়ে জীর্ণ বস্তিবাসীর ইস্কুল ভেঙে। কবি কল্পনা করেন একদিন হয়ত গুঁড়িয়ে যাবে পাঁচিল, হুড়মুড়, করে ঢুকে যাবে বস্তিবাসী নও জোয়ান। মাঝে মাঝেচলে আসে দার্শনিক কথা। 'যন্ত্রণার মন্ত্রণা' কবিতায় কবি বলেছেন প্রেম বাঁচার উপাদান কিন্তু পৃথিবীতে বাধাবন্ধহীন প্রেম কোথাও নেই আর প্রেমকে বধ করতে উদ্যত অনেক অসুর। এই বিষয়টিকে যে কাঠামোতে, যে ভাষায় বলতে কবিত্বের বর্ণ বিচ্ছুরণ ঘটে, তা তিনি করতে পারেন নি। কবিতার ভাষা, কবিতার উচ্চারণ যে আলাদা সেটা দুঃখের বিষয় তিনি মাঝে মাঝেই ভুলে যান। একথা প্রযোজ্য 'অধিক আয়ুর অধিক ারী' কবিতার ক্ষেত্রেও। একদা বাড়ি ছিল উৎসব মুখরিত। আজ সব অযত্নে ধূলায় মলিন, কবি নীরব সাক্ষী। তাঁর বেদনা--- প্রাণ কেন ক্ষণস্থায়ী, কেন নিষ্প্রাণ বস্তু অধিক আয়ুর অধিকারী। 'সেই গটাকে চাই'তে আসে অভিজ্ঞতা, কাহিনী হিসেবে। তিনি একদা উত্তরবঙ্গের প্রান্তরে শীতের রাতে পথ হারিয়েছিলেন। একটা গ তার হাত চেটে দেয়, পথ দেখায়। ত ারপর গন্তব্যে, এক চাষীর ঘরে পৌঁছান। সকালে পুলিস এসে চাষীর ধান ও গ বাছুর নিয়ে চলে যায়। কবি অনেককাল পরে আজ ফিরে চান সেই গটিকে--- 'সে যে অনেক বিদ্বানের চেয়ে বেশি জানে পথের সন্ধান।' 'চাঁদিনী রাতের ও শারদ প্র াতে'ও কাহিনী কবিতা। গ্রামসভা, ঘরোয়া বৈঠক সেরে এক কৃষকের ঘরে অন্নপ্রাণ বিশ্রামের জন্য খাওয়া। কিন্তু পথে নান া গ্রামবাসীর সমস্যায় মাথা গলিয়ে ক্লান্ত তারা আসেন নিরন্ন এক কমরেড কৃষকের ঘরে। খাবার নেই অগত্যা শুয়ে পড় া। নিজ বাচচার দুধটা তুলে দেওয়া এই দুই নেতাকে। বৌ চেঁচায় এজন্য। কৃষক বলে--- 'তোর চামচিকেটা কাঁদুক/ কমরেড কি ফের পাব আমার ঘরে।' এক কমরেড আর একজনকে স্মরণ করিয়ে দেন ভুলে যাবেন না, ক্ষুধাতুর শিশুর দুধ খেয়েছেন, তাহলে আপনার কলম সুবিধাবাদী হতে পারবে না। পথে সকালে চলতে চলতে ভিক্ষুকের ঝুলির চাল রাস্তায় পড়ে গেলে এরা খুঁটে খুঁটে তুলতে সাহায্য করে। অভিজ্ঞতার স্বীকারোক্তি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই ক্ষুধার্তের অ

াত্মত্যাগ কি কলমনবিশ কবিরা চিরকাল মনে রাখতে পারে? মনে রাখতে পারলে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে সমীর রায় 'হাতের কলম জন্ম দুখি তাকে বেচো না' তাঁদের কবিতায় এই কথাই তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রগতিশীল কবির ক্ষেত্রেও এই বিচার প্রযোজ্য হবেই---ইতিহাসের এ এক অনিবার্য বিচার। তাই নয় কি?

'জগৎজয়ের যাত্রী' বেরোয় ১৪০৫ অর্থাৎ ১৯৯৮ তে। এখানেও অনেক কবিতা। 'অদ্ভুত জন্তু' কবিতায় মুমুর্ষু পুঁজিবাদির কথা যার প্রভাবে পৃথিবীতে নেমে এসেছে আঁধার ও বিষ। বিদ্ধে দাঁড়াতে হবে মানুষকেই। পুঁজিবাদের মৃত্যুতে কবি সংশয়হীন, মানব সংগ্রামে সংশয়হীন। কবির সরল স্বপ্নের জগতে শোধনবাদ নেই, প্রগতিশীল সাবোটাজ নেই, সমাজতন্ত্রী মুখোশ নেই, পুঁজিবাদের অপ্রতিহত জয়যাত্রা নেই। কাহিনীর আভাস বারে বারেই তাঁর কবিতাকে করে তোলে সমৃদ্ধ। ভগৎ সিংহ তাঁর ফাঁসির প্রাক্কালে লেলিনের একটি ছোট্ট বই পড়ছিলেন, তাতে তিনি কোন সিদ্ধির কৌশল সন্ধান করছিলেন কে জানে? ফাঁসির সময় হলে তিনি বইটি জেল কর্মচারীদের হাতে দিয়ে বলে যান--- 'তোমাদের অঢেল সময়/ পড়ো, দেখার পর ব্যাটলশিপ আরোরা, জানা গেল বৃদ্ধ গাইডই কামান চালিয়েছিলেন। করমর্দনের পর থেকে 'কলম হ াতে নিয়ে বসলেই / আঙুলগুলো ভয় দেখায়---/ কার হাতের পরশ পেয়েছে স্মরণ আছে?' 'চাঁদনী রাতের ও শারত প্র াতে' কবিতার ক্ষুধিত শিশুর দুধের শপথ মনে পড়ে। অরোরা - বৃদ্ধ উজ্জীবিত সেই কলম কি আজও জেগে আছে। কোথ ায় তার গর্জন, কবিতার ভিড়ে বিভ্রান্ত পাঠককেই তা অনুসন্ধান করতে হবে। বিশ্ব একটি পণ্যের কান্না আর একটি মানুষের কান্না। রামপ্রসাদকে সম্বোধন করে কবি ইতিহাসের এই দুই কান্নার সূত্রে ঐতিহাসিক দুর্গতি এবং সবকিছুকে 'সেল' করে দেবার বিপ্রবণতার কথা বলেন। কবিতায় চমৎকার পংক্তি আছে ('ভূরি ভোজিদের টেবিল থেকে ছাড়া পেয়ে ফসল গ াইছিল শ্রমের সঙ্গীত') আবার দুর্বল পংক্তিও আছে ('ওদের হয়েছে বড্ড বেশি তেল') (দুই কান্না) বিব্যাঙ্কারদের সর্বত্রগ ামী চক্ষু। কবিতায় আসে রূপকথার শুকসারী। আত্মরক্ষার্থে ঘুম ভাঙা মানুষ নিশ্চয়ই চড়ে বসবে শুকসারী বসা গাছে, সে ডাল না কাটলে বেঁচে যাবে। (গোদাবরী তীরে) নামনা জানা দুর্জয় সাহসী দুই মেয়ে অ্যারোহী সৈন্যের সামনে দাঁড়িয়ে পত াকা কিছুতেই নামায় না, পিছনে উল্লাস। এই গল্প লেনিন বলেছেন। কবি এদের শৌর্যে মিলিয়ে দিতে চান লক্ষ্মীবাঈ, জোয় ান অফ আর্ক, মাতঙ্গিনী হাজরার কথা। (নাম না জানা দুই মেয়ে। মাকি ওমাজারি দুই সাঁওতাল বোন, মাটি চাপা পড়ে ম ারা গেল। ওদের কারখানায় আটমাস ধর্মঘট, পেটের দায়ে এসেছিল পুকুরে মাটি কাটতে। মেয়ে দুটির সঙ্গীসাথীরা মিছিল করে চলে ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য কলকাতায় মালিকের অফিসে। প্রকৃতি ও চারপাশে তাদের উৎসাহনেই। পথে অভ্যর্থনা, বহু মানুষের যোগদান ঔৎসুক্য ও শব্দিত ক্ষোভে। কবির মনে হয় সেই দুই বোন এবং তিনি নিজেও যেন হাঁটছেন মিছিলে। অনস্বীকার্য শ্রমিকের প্রতি একাত্মবোধ তাঁর কবিতার সম্পদ। (মাকি ও মাজারি) কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের জমীদ্দিন, যে বঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ, স্বদেশী মালিকের গুণ্ডার ছোরায় নিহত, তার প্রতি শ্রদ্ধার্পিত কবিতা। (জমীদ্দিনের রক্ত) 'রানীগঞ্জে শহীদ সুকুমারের স্ট্যাচু' এমনই কবিতা। পাড়ার বহু মসজিদ ও মন্দির নির্মাতা আতর আলি যখন বৃদ্ধ হল তখন শুধু ভাঙা বাড়ি সারানো ছাড়া অন্য কাজ জোটেনা। ফলে বেশির ভাগ সময়ই বেকার। কবি তাকে ভিক্ষুক রূপে মসজিদের সামনে দেখেছেন একাধিকবার। (আতর আলির মন্দির মসজিদ) লুৎফা দীর্ঘ ত্রিশ বছর স্বামী সির াজদ্দৌল্লার কবরে প্রদীপ দিতে যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও ছেদ ঘটাতে পারেনি একাজে। কবি ভাবছেন সিরাজ যদি বেঁচে থ াকত তাহলে হয়ত এই দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ মরত না। আর লুৎফার প্রদীপের শিখায় তিনি সন্ন্যাসীর তরবারি, সাঁওতাল ধনুর্বাণ, ক্ষুদিরাম, মঙ্গল পাণ্ডেকে প্রত্যক্ষ করেন। (লুৎফার প্রতি) সিরাজ সম্পর্কে ইতিহাসের বিচার, ব্যক্তি কিভাবে দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধে সক্ষম এসব প্রশ্ন উঠবে। ব্যক্তির প্রয়াসকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখারপদ্ধতিটা খুবই ভ ালো, কবি অনেকক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করেছেন। রামচন্দ্রীয় পুরাণ কাহিনীর মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আছে 'শ্রী রামচন্দ্রের প্রতি'কবিতায়। কবির মতো সীতা উদ্ধারকারী রামকেই 'এবার উদ্ধার করা চাই ভক্তরূপী শত্রুর কবল থেকে'। বাল্মীকির থেকেঅবসাদ ঝোড়ে ফেলে অগ্রসরণের প্রেরণার কথা 'সেই দৃষ্টির আলোকে'। কবিতায়। সুভাষ ও সিরাজের বন্দনীয় বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে সুভাষ - সিরাজ নাম রাখার প্রস্তাব। ছেলে নাস্তিক হওয়ায় মায়ের দুঃখ 'মায়ের মোনাজাত' কবিতায় আর বঙ্গবিচ্ছেদের বেদনা মাতৃদুঃখে 'মায়ের আঁচল' কবিতায়।

বাংলাদেশে দেড় লক্ষ চটকল সুতোকল শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল, পুলিস মিলিটারির গুলি চালনায় বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যার জল রক্তে লাল হয়ে গেছে। এ পার বাংলায় চটকল মজুররা প্রতিবাদ জানাতে আসে বাংলাদেশ মিশনের সামনে। কবি জ

ানান ---'তোমাদের পাশে আমরা আছি। এপার বাংলায় আমরা চুপচাপ থাকতে পারি না।' (ওপার বাংলার শ্রমিক ভ াইবোন শোনো) কবি স্মৃতিরোমন্থন করেন বিপ্লবী দিনে 'জ্বলছে লাল নিশান / পুলিসের বন্দুকের মুখে/ প্রাণের ধানের ট ানে।' কৃষকের ঘরে শীতের রাতে শুয়ে থাকার স্মৃতি, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু। জান দেব তবু ধান দেব না। (বিমনা হয়ে থেমে যাই কেন) গঙ্গার বুকে নাবিক বিদ্রোহ নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতায় আছে ৩৫ হাজার মানুষের জ্বলে ওঠা ও ব্যর্থতার কথা কা হিনী বর্ণনার অনুপুঙ্খতায়। (গঙ্গার বুকে অক্ষর) মালিকের বাড়িতে কয়েকশ নিরীহ মানুষ এসে কারখানা খোলার দাবি জ ানালে মালিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পালায়। (নির্জন পাড়ায়) একদা মিত্র পরে মন্ত্রী, পরিবর্ত্তন, বেদনা কিন্তু এই মিত্রই ছিল কলকাতায় লেনিন মূর্তি স্থাপনে সহায়ক (চির চলমান) তিনটি বালক সস্তায় চাল কিনে আনে, থাকে খিদিরপুর বস্তিতে। ব াসে আলাপ (ওরা তিন যোদ্ধা) প্রাসাদপুরীর বাসিন্দারা মদগরী বিলাসিরা শহীদের নামগন্ধ মুছে দিতে যায় বলে কবির বেদনা। (শহীদ ফেরেনি ঘরে) হো চি মিন বন্দনা, যিনি প্রকৃতি ও মানুষকে ঋি বিপ্লব যাতে সামিল করতে চেয়েছিলেন নিজ দেশে ও সর্বত্র। (হো চি মিনের উইল), জগৎ জয়ের জন্য কবির ডাক। ঋি ভ্রাতৃত্বের সঙঘবদ্ধতা হলে জয় আসবে হাতের মুঠোয়। (জগৎজয়ের যাত্রী) এই বইয়ের কবিতাগুলো পড়ে মনে হয়--- (ক) কবি শ্রমিক ও সংগ্রামীর সঙ্গে একাত্মবোধ বজায় রাখতে চেয়েছেন সাম্প্রতিক কালেও। (খ) দেশ ও বিদেশের সংগ্রামকে এক করে দেখার প্রবণতা আছে। (গ) সবচেয়ে বড়ো কথা --- এমন অনেক তুচ্ছ অথচউল্লেখ্য সংগ্রামের কথা ধরা আছে তাঁর কবিতায় যা ইতিহাস বইতে নেই, অথবা বড়ো ঘটনার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। এই দলিলীকরণের ঋিস্তুতার জন্য একালের পাঠক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থ াকবেই। (ঘ) কাহিনী ও প্রসঙ্গকে কবিতা করে তোলবার ব্যাপারে তিনি গুত্ব দিয়েছেন কম।

কুসুমিকা ও বহিশিখা (২০০২) বইয়ের প্রচ্ছদে ও আখ্যাপত্রে লেখা আছে 'প্রেম ও রাজনীতির কবিতা' এখানে কবির ব্যক্তিগত প্রেমের কণ কথা ও বিশেষ ও নির্বিশেষ রাজনীতির কথাই আছে দুটি অংশে যদিও রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে দুটি অংশে। ১৯৫৫ সালের ৫ই মার্চ কবি পত্নী ইতিহাসের জনপ্রিয় অধ্যাপিকা এবং দুটি কলেজের অধ্যক্ষ হেনা মৈত্র পরলোকগমন করেন। প্রেম তাঁদের দীর্ঘকালের হলেও বিবাহ হয়েছিল প্রৌঢ় বয়সে। এ প্রেমের পথে ছিল দুস্তর বাধা কিন্তু মনের মিল ও টান ছিল যথেষ্ট। কখনওকবি বলেছেন স্ত্রীর জবানীতে তাঁর ছোটবেলায় চিত্রকার পিতার বাড়িতে শরৎচন্দ্র এবং স্কুলে রবীন্দ্রনাথের আসার কথা (সকালের ফুল) কখনও তণী শিক্ষিকা ক র্তৃক বিদ্যুৎলতার মতো জনযুদ্ধপন্থীদের রিলিফ কমিটিতে স্থান দেওয়ার কথা (আবির্ভাব), সদ্য পিতৃহারা ছাত্রী অর্থাৎ স্ত্রীর টিউশন করে বাঁচার কথা (ভাষার সূত্র), অন্তহীন বাঁচার লড়াইয়ের মধ্যে ভিন্ন ধর্মের যুবকের সঙ্গে প্রেম ও ছাড়াছাড়িকথা (ব্যাফলওয়াল), অসুস্থ প্রেমিকাকে সহপাঠীদের সঙ্গে দেখতে যাওয়ার জায়গাটা বাড়ির লোকের দ্বারা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দ্যেয়া কথা (ম্লচ্ছ বিদায়), মেয়ের ভালোবাসা মায়ের সেবা (চোখের জলের নামল ধারা) ও মায়ের মৃত্যুর কথা, মধুসূদনের কবরে দুজনে বেড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতির খপ্পরে পড়া (পিশাচের খপ্পরে), দেশ বিভাগের বিষেয় মধ্যে প্রেম অপেক্ষা কাজকে বড়ো করে তোলা ও পুলিসের হাতে সর্বদা ধরা পড়ার আশঙ্কা, অসুস্থতার যন্ত্রণা নিয়েও প্রেমিকের কাছে আসা (পদ্মপত্রনীর), ট্রেনে প্রেমিক প্রেমিকার য াত্রা, ভালো লাগার উচ্ছাস (চলার আনন্দ), রক্তকরবী পরিচালনা করার পর কলেজ কর্ত্তার প্রণয় নিবেদন (নবনন্দিনী), র াস্তায় প্রেমিকার জন্য প্রতীক্ষা(অবরোধবাসী), দাঙ্গাদুর্গত রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিতে দুজনের ফেরা (ভবিষ্যভারত), পড়ানোর কৃতিত্বের কাহিনী (শাঁখের করাত) মুসলমানপ্রেমিক বলে যোগমায়াদেবী কলেজে চাকরি না হওয়া (সজুর সহৃদয় তবুও), সৎ ঋিস্ত দারোয়ানের মৃত্যুতে মধ্যরাত্রে ট্যাক্সিতে কলেজে গিয়ে ব্যবস্থা করা (দরোয়ান জী), সহকর্মীদের মধ্যে হেনাদির রহস্য উক্তি --- 'আমি হলাম চিরকালের ধ্রুবতারা (চিরকালের ও ক্ষণকালের), ধূপদানি নিয়ে সংসার করতে আসা, মৃত্যুর পর স্বামী স্ত্রীর কৌতূহলী চোখের সামনে শতাব্দীব্যাপী জেগে থাকা (যাদুঘরে), হেনাদির সৎকার নিয়ে গণ্ডগোল এবং পুরসভার নির্দেশ ধর্মোর্দ্ধ (শ্মশানে ও সংগ্রাম) প্রভৃতি অজস্র কবিতা আছে প্রথম অংশে, তার ফাঁকে রাজনীতি ও দৃপ্তত া ও সহৃদয়তার কবিতাও আছে। এ প্রায় ডায়েরীর নির্বাচিত অংশ, স্মৃতি তর্পণ, দুজন মানুষের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, অ াদর্শগত ঐক্য, সম্পর্কের নিবিড়তা এসবই বোঝা যায় কিন্তু অতীবদুঃখের বিষয় এগুলি কবিতা হয়ে ওঠেনি, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি পংক্তি বা ইমেজ কবিতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনাময় হলেও কবিতা হয়ে ওঠার যে শৈল্পিক শ্রম তাতে কবি আগ্রহ দেখান নি। দ্বিতীয়অংশে কবির আবার ফিরে পেতে চান শ্রমিকের ঋিরূপ (বাঁশরি বাজাও আবার), স্বপ্ন দেখেন নজলকে ঋিবিপ্লবের আলোয় সবাইনেতৃত্ব দিতে ডাকছে (নজলকে আসতে দাও), বালকো কারখানার শ্রমিকরা খালিককে প্রবেশ

করতে দিচ্ছে না, এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় তিনি প্রচার করেন শ্রম ও পুঁজি দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হলে পুঁজিবাদের মৃত্যু অবধারিত (বালকো কলিং), বাংলাদেশে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দীপা দত্তের মিছিল নিয়ে যাওয়া, আসাদুজ্জামান পুলিসের গুলিতে নিহত হলেও জ্বলন্ত পদক্ষেপ অব্যাহত থাকায় মিলিটারির অস্ত্র সংবরণ (বহ্নিশিখা), জীবনানন্দের আঁধার দর্শনের বিপরীতে অ ালো আবিষ্কার, লেনিনগ্রাদ ও স্ট্যালিনগ্রাদ দর্শন করে কমিউনিস্টদের ভিন্ন ধাতুদের উপলব্ধি, সুবিধাবাদীদের পদাঘাত (বলাকা শ্রেণী উর্দ্ধে উড়ে যায়), বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্বলতাই সন্ত্রাসের অতি উর্বর গোচারণক্ষেত্র --- এই উপলব্ধি (সন্ত্রাস), মজুরদের সঙ্গে লেনিনের শেষ সাক্ষাৎ (শেষ সাক্ষাৎ), বড়লোকদের বাড়িতে, ফুলবাগানে বস্তিবাসীদের ঢুকিয়ে দেবার বাসনা (একটু পা গুটিয়ে বসো), ডাক্তার সমর রায় চৌধুরীর সেবাব্রতী রূপের পরিচয় দান (সুখ), রামের দুর্গতিকে রাজনীতিবাদীদের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা (রামচন্দ্র ও নারীবাদী) স্বপ্নসাথী সংগ্রামী মৃত ও জীবিত বন্ধুদের স্মরণ (স্বপ্নসাথীরা শোনো), মানুষ হারিয়ে যায়। বিশ্বসংগ্রামে সে বেঁচে থাকে (রকমফের), অজান্তে আণবিক বিস্ফোরণের প্রেরণা দিলেও বিজ্ঞান ও শিল্পের যুগপৎ সাধনা আইনস্টাইনের (আইনস্টাইনকে)। এইসব কবিতা, হয়ত কোনো কোনোট া সমসাময়িক তাগিদে লিখিত, কিন্তু তিনি সততসংগ্রামের, বিপ্লবের, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ ও পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন। এই ব্রতকেই তিনি বড়ো বলে মনে করেন, ফলে অনেক কবিতাই কবিতা হিসাবে পাঠের একাধিকবারের আগ্রহ বজায় রাখতে পারে না। যদিও শ্রমিক চেতনা অটুট।

'স্বেচ্ছাবন্দী' বইটিতে (১৯৭৪) আছে একগুচ্ছ রাজনৈতিক কবিতা। কবির মতে পৃথিবী এক যুদ্ধক্ষেত্র, ক্লান্ত হলেও ক্ষমা নেই। (স্বেচ্ছাবন্দী) ক্ষুধার চাবুকে ধর্মঘটিরা নতিস্বীকার করে, জয়ের চেয়ে পরাজয়ই বেশী। তবু মালিকের পাশবিকতা ব াড়লেও কবি আশাবাদী। (কসাইদের অবগতির জন্য) হ্যামলেট নাটক প্রসঙ্গ এনে শ্রমিক শ্রেণীর গুত্বকে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয় াস আছে। (এসো যুবরাজ, হও সম্রাট) চার্টিস্ট আন্দোলনের এক অজ্ঞাত ইংরাজ কবির রচনা অনুবাদ মারফৎ অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য জয়ের কথা। (সব দেশেরশ্রমিকদের প্রতি) কবি লক্ষ্য করেছেন যাদের যত লাভ যারা যত লোভের পূজারী ত ারাই তত সুন্দরের অধিকারী। আর যারা কর্ম ও ঘর্মদিয়ে সুন্দরকে গড়ে তুলছে তারা সুন্দরের সপত্নী সন্তান। (কথা ছিল) বিপন্ন মানুষ যার ছেলে বৌ অসুস্থ, উৎখাত হবার আশঙ্কায় তারা কিভাবে সুন্দরের দিকে তাকাতে পারে। (চাপে চ্যাপ্টা) ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক তার তীক্ষ্ণ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে কবির সঙ্গে বসে পড়ে সরাইখানায়। (আমার নাইস হোটেলর সঙ্গী) এর ফাঁ াকে দক্ষিণ ভারত থেকে রাজনৈতিক কর্মীবন্ধুদের সঙ্গে বেড়িয়ে ফেরার পথে ট্রেনে 'বিশ্বের বিচিত্র লিপিকা' দেখতে দেখতে একঝলক নিঃসঙ্গতা এসে পড়ে মনে। (নিঃসঙ্গ) একটি শিউলি গাছকে মুগ্ধদৃষ্টিতে নিজের মনে হয়েছিল কিন্তু সেই সৌন্দর্য, নম্রতা পেয়েও ভোলেন না এ গাছ তার নয়। (শিউলি) ঝড়ে অবিচলিত গাছ ও তার উদারতা দেখতে দেখতে কবি অনুভব করেন গাছেদের ও ভাষা আছে, আর মনে আছে যুদ্ধকালে নানা দেশাগত গাছ গড়েছিল আন্তর্জাতিকতার মেলা। (গঙ্গ াপারের বাগানে) বৃষ্টিতে আবদ্ধ ঘরে বসে 'বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আবেশ'। বাসস্ট্যাণ্ডে লক্ষ্য করেন কৃষ্ণচূড়া গ্রীষ্মের দিনেও ঠিকসময়েই ফোটে, অথচ মানুষের মধ্যে সময়ের বালাই নেই। (অন্ততঃ কৃষ্ণচূড়া) নিজেকে শ্রমিক ভেবে ক াজের মধ্যে থাকতে চান (যা নেই তা খুঁজি না), জগৎজোড়া হিংস্র পশুপ্রতিম মানবদের সম্পর্কে সতর্ক করতে চান সব াইকে। (জীবজন্তুর বিচরণ) বিড়লা পরিবারের অপ্রতিহত লোভের ব্যাপ্তি এবং হাজার হাজার শ্রমিকের লক আউট জনিত বিপর্যয় দেখেও কবির বিশ্বাস, মালিকদের ভবিষ্যৎ নেই (কী নেই তার) কবি নিজেকে রেসের ঘোড়া মনে করেন, জানেন দুর্বল হয়ে পড়লে স্থান হবে আস্তাকুড়ে। (রেসের ঘোড়া) দুটি কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতার সন্ধানে কবিমনের ব্যাকুল সন্ধ ান কমলাকান্তের মত। (কোথায় আমার কবিতা) আর একটিতে তিনি বলেছেন তিনিরিপোর্টার, চিরন্তন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননি। তিনি প্রকৃতি ও মানুষের টাটকা খবর পেশ করে দেন, তিনি 'প্রায় একজন পোয়েট'। এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি জীবন ও জগতের অবস্থান, সংঘাত, জয়পরাজয় প্রায় একজন পোয়েট' অথবা রিপোর্টারের মত লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতা এলেও শ্রমিক শ্রেণীর জয় বিষয়ে নিঃসংশয় বিশ্বাস লালন করেয ়াছেন। এই সংশয়হীন অব্যাহত বিশ্বাস তাঁর সমকালীন পরকালীন একজন কবির মধ্যেও দেখা যায় না। কবি তাঁর দ্বান্দ্বিক জীবনপটকেএইবইতে অনেক সময় প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করছেন, অথচ সৌন্দর্যমুগ্ধতাকে বিসর্জন দেননি।

সংগ্রামী বন্ধুর অধঃপতন, সুবিধাবাদ প্রভৃতি দেখে তিনি ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কথা বলেন। জীবন ও তত্ত্বের এই পারস্পরিকতা অনেকের কাছে নেহাৎই কেতাবি কথা থেকে যায়, এক্ষেত্রে তা নয়। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

'ইরাকে ঈগল' (২০০৩) বইটির প্রথমাংশে আছে ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসন বিষয়ে এক দীর্ঘ কবিতা। যে কবিতাটির কাব্যমূল্য হয়তো সামান্য, কিন্তু তথ্য ও বিশ্লেষণমূল্য যথেষ্ট। বলা যেতে পারে কাব্যাকারে ইতিহাস ও ইতিহাসের ব্যাখ্যান। এ কবিতা শেষ হয় শ্রমজীবীর লংমার্চের দিকে স্বপ্ন সন্ধানী দৃষ্টিতে। এরপর আছে অনেকগুলি ছোট কবিতা। 'নীচে নামো' কবিতাটি চমৎকার, যেখানে প্রকৃতিও সমাজে নিচে নামার দিকে, উপরিতলে আসন্ন ধবংসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কবিতারই ভাষায়। আছেমৌলবাদের সাপকে ডায়ালেকটিকসের নেউল দিয়ে বধ করার পরামর্শ। (প্রতিকার) অ াছে বাউলের গান মানব বন্দনায় পশু নিন্দার অভাবের কথা (বাউলের প্রতি) 'বাবর ও যযাতি' নামক কাব্যনাট্যে তিনি এই দুই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রচল বৃত্তান্তকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে সাইবেরিয়ার সারস এর অগ্রগতি বন্দনা (স াইবেরিয়ার সারস), ধনতন্ত্র ধারকদের অপসংস্কৃতির মুখোশ উন্মোচন স্পষ্ট ভাষায় (ভয়ঙ্কর ভক্ষক)। কবি শুধু ইতিহাস প াঠে অগ্রণী শিক্ষা গ্রহণেও কবি তৎপর (পরাজয়ের প্রতিবিধান) সবশেষে তাঁর চরিত্র রচনারআগ্রহ থেকে কাব্যের ভাষায় আসে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে হিউম্যান শীল্ড হতে চাওয়া বাসিরা বা রোজ মেরী নাম্নী দুই কন্যার আত্মোৎসর্গের কথা। (অচঞ্চলা) কবি বইটি উৎসর্গ করেন এই দুই নির্ভীক শহীদকে।

গোলাম কুদ্দুস অনেকদিন যাবৎ প্রচুর কবিতা লিখেছেন কিন্তু তাঁর কবিতা আলোচনার মধ্যে আসেননি অন্ততঃ গত কুড়ি ত্রিশ বছরে। আজকের পাঠক যদি তাঁর কবিতার বইগুলি নিয়ে বসেন তবে লক্ষ্য করবেন তাঁর কবিতায় রাজনৈতিকতাই প্রধান। প্রথমাবধি তিনি বিভিন্ন জনসংগ্রামের, দেশীয় ও বিদেশী, বড় ও ছোট তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছেন, জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেও রাজনৈতিকতাই লক্ষ্য করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িয়ে দেখতে হবে। ধনঞ্জয় দাশ লিখছেন ১৩৫৪ নাগাদ সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস ও অনিল কাঞ্জিলাল এর 'বৈপ্লবিক দৃঢ়তা' 'কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন অনুসৃত নীতি ও রবীন্দ্র গুপ্তরসাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিচার বিশ্লেষণের প্রতি এঁদের ছিল অকুণ্ঠ আনুগত্য', এঁরা পার্টি নীতিকে 'অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে' বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হন। (মার্কসবাদী সা হিত্য বিতর্ক, ২য়) ১৯৫০ এ ঢাকা থেকে হঠাৎই টেনে এনে পরিচয় পত্রিকার দায়িত্ব দেওয়া হয় হয়ত এই 'আনুগত্য' বিচ ারে, যদিও এ দায়িত্ব কবির 'ফাঁস' মনে হয়েছিল। অল্পদিন পরেই পার্টিলাইন বদলায়, তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। র াজনৈতিক নেতাদের হঠাৎ হঠাৎ রাজনৈতিক আদর্শ বদল, কর্মসূচি বদল এবং কবি সাহিত্যিকের ওপর তা চাপিয়ে দেওয় া, স্বাধীন চোখ কান খোলা না রাখতে দেওয়া একটা বিষম সমস্যা, যা পাশ্চাত্যে যেমন, আমাদের এখানেও হয়েছে। ত ারপর পার্টি ভাগ হয়, আরো ভাগ হয় কুদ্দুস সাহেব সি. পি. আই তে থেকে যান এবং রাজনৈতিক দল বদল ও শ্রমিক কৃষককে নিয়ে মিটিং মিছিল, পার্লামেন্টে আলোচনা, সূক্ষ্ম জটিল তর্কবিতর্ক চলতেই থাকে। দরিদ্র জনসাধারণ যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যায়। কুদ্দস সাহেব শেষ কবিতা বই পর্যন্ত শ্রমিক অনুরাগী কিন্তু তাঁর লেখা থেকে জনসাধারণের এই দুর্গতিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা নেই। মুখে প্রগতিশীলতা অন্তরে প্রগতিবিরোধিতা নিয়ে ২/১ টি সাধারণ কবিতা ছাড়া কিছু নেই। স্ট্যালিন বন্দনা করেছেন তিনি কিন্তু স্ট্যালিন কে কি আজ সরলভাবে বন্দনা করা য ায়? পরবর্তী সোভিয়েত শাসকদের কর্মনীতির, চীন শাসকদের কর্মনীতির গত দুই দশকের পরিবর্তন নিয়ে কোনো কথা বলেন নি। আমেরিকান আগ্রাসন নিয়ে অনেক কথা আছে কবিতায়, কিন্তু সোভিয়েত আগ্রাসন নিয়ে তিনি নীরব কেন? একটি কবিতাতে আছে সোভিয়েততন্ত্রর ভেঙে যাওয়ার জন্য মর্মবেদনা। ফলে শ্রমিক সান্নিধ্য তাঁকে অন্ততঃ মূল জায়গাটা স্পর্শ করে থাকতে সাহায্য করেছে কিন্তু তা এতই সরলীকৃত যে আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারে না। স্বাধীনতাপরবর্তী ভ ারতবর্ষের অধোগতি সম্পর্কে তাঁর সেই ক্ষোভ নেই যা ছিল 'বিদীর্ন' ও 'ইলা মিত্র' বই দুটিতে । ক্ষোভ ও ক্রোধ তিনি সযত্নে পরিহার করেন কোন বিবেকের তাড়নায়? যে ইলা মিত্রকে নিয়ে তিনি সাড়া জাগানো কবিতা লেখেন সেই ইলা মিত্র যখন ইন্দিরার জরী অবস্থার সমর্থনে বিবৃতি দেন তখন কবি একটি অনুচ্ছেদও যোগ করেন না কেন পূর্বোক্ত কবিতায়। অথবা রচনা করেন না কেন এ নিয়ে পৃথক কোনো কবিতা? একাধিক সরকারী পুরস্কার গ্রহণে তার সম্মতি কিন্তু তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যায় জনতার পুরস্কার গ্রহণ থেকে। তাঁকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা হবে হয়ত ধৃষ্টতা।

১ নং 'মাকাসাবাদী'তে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন লেখেন---সহজ - সরল এবং উদ্দীপনাশীল কলাকৌশলের সাহ ায্যে সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে, যে কলাকৌশল সংস্কৃতির দিকে সাধারণ ম ানুষের মন টেনে নিয়ে আসে, সাধারণ মানুষের ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে সেই কলাকৌশল সৃষ্টি করতে হবে।' (ব

াংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা) প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ ৪নং 'মার্কসবাদী'তে গুদাস পালের 'উচচকণ্ঠ, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ' চারটি পংক্তি তুলে বলেন এটাই শ্রেষ্ঠ প্রগতিবাদী কবিতার মডেল, যা লেখবার 'মুরোদ' বিষ্ণু দে-র নেই। (বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা)। আরো বলেন গোলাম কুদ্দুসের বেশ কিছু ভালো কবিতা আছে, সেকালে এবং এক ালে লেখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অনেক কবিতা আছে যেখানে তিনি কবিতার নিজস্ব ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন নি, অথচ তিনি যে তা পারেন তার পরিচয় আছে। 'কবিতার কাঁচা মাল'কে কবিতা করে তোলবার, বারংবার পঠনযোগ্য কবিতার সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় হয়ে গেছে। পরিবেশ থাক আর না থাক আগামী বিপ্লবের একটিসহজিয়া ডাক দিয়ে কবিতা সমাপ্ত করেছেন অনেক সময়ই। তিনি কবিতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সৎ ও অসৎ, সাদা ও কালো রূপেচিহিত করে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা করছেন, তা শিল্প করে তুলতে পারেন নি। ফলে প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য মুখ্য হয়ে গেছে, প্রক াশভঙ্গি গৌণ হয়ে গেছে। তিনি শ্লোগান তুলেছেন কবিতায়, কিন্তু শ্লোগানকে কবিতা করে তুলতে অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। হয়ত একারণে সুকান্ত পুণচচারিত, গোলাম কুদ্দুস নন। আজকের লোকে তাঁকে 'ইলা মিত্র' রচনার কবি বলেই জানে। অথচ 'বিদীর্ণ' বা 'স্বেচ্ছাবন্দী'র কিছু কবিতা আছে যা এখনও পাঠযোগ্য। পার্টি নির্দেশের বহুরূপী খেয়ালের যূপকাষ্ঠে শ্র মিকশ্রেণীর কাছে আসা এক কবি হারিয়ে গেলেন তলিয়ে গেলেন এ বড়ো দুর্ভাগ্যের ঘটনা।

বিনয় ঘোষ অনেক কাল আগে লিখেছিলেন---প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে 'উদ্দেশ্য' তাই মূখ্য, প্রকাশভঙ্গি গৌণ, সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশভঙ্গি, অর্থাৎ ভাষা, ঘটনা - গ্রন্থন ও চরিত্র - চিত্রণই মুখ্য, উদ্দেশ্য গৌণ। সাহিত্য, প্রোপাগান্ডা দুইই উদ্দেশ্যমূলক হলেও, দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আকাশ মাটি।' অর্নেস্ট টলারের একটি উদ্ধৃতি বিনয়বাবু ব্যবহার করেছেন। তার অংশ - There is one simply between good and evil, black and while. এতে profundity of art জন্ম নেয় না।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com